নবপর্যায় : ১ম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, মে ২০২১

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

"জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণাধারায় এসো
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়
গীতসুধারসে এসো..."

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তার প্রথম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যাটি প্রকাশিত হচ্ছে ঈদ উৎসবকে সঙ্গে করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সকল সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ীকে জানায় ঈদের শুভেচ্ছা। জাদুঘর বার্তা পূরণ করছে একটি বছর। ২০২০-এর মধ্য-মার্চে আকস্মিক অতিমারির কারণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হয়, কিন্তু অতি দ্রুতই নাগরিকজনের এই প্রতিষ্ঠান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে বেছে নেয় সকল কার্যক্রম সক্রিয় রেখে সুহৃদদের সাথে সংযুক্ত থাকার উপায় হিসেবে। এরই ধারাবাহিকতায় জুন ২০২০ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে জাদুঘর বার্তা। একটি বছরে বার্তার গ্রহণযোগ্যতা, পাঠকপ্রিয়তা বৃদ্ধি যেমন আনন্দদায়ক, তেমনি এক বছর পার করে আবারও জাদুঘরের দরজা জনসাধারণের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে বন্ধ করা বেদনাদায়ক। এবছর যেন অতিমারির প্রকোপ বৃদ্ধি পেল বহুগুণে। কেবল বাংলাদেশ নয়, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসহ গোটা পৃথিবীই অসুস্থ। সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় আছেন কখন এক করুণাধারায় পরম প্রকৃতি সুস্থ হয়ে উঠবে, মানুষ ফিরে পাবে স্বাভাবিক জীবন। তবে যেমন মৃত্যু আছে, দুঃখ আছে, শোক এবং কষ্ট আছে, পাশাপাশি আছে এই বিরূপ পরিস্থিতির বিপরীতে দাঁড়িয়ে মানুষের এগিয়ে যাবার গল্প। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরও সচেষ্ট রয়েছে তার কর্মকাণ্ড সক্রিয় রাখতে, বন্ধ হয়নি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ পালন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের রজতজয়ন্তী উদযাপন, ভিন্ন আঙ্গিকে অন্যতর মাত্রায় নতুন পরিস্থিতি মেনে নিয়ে চলছে জাদুঘরের আয়োজন। আরো চলছে বাংলাদেশে গণহত্যার পঞ্চাশ বছর ঘিরে স্মরণ ও শিক্ষাগ্রহণের আন্তর্জাতিক আয়োজন, যার তাৎপর্য অপরিসীম।

বাংলা নতুন বছরকে উৎসবের রঙে বরণ করে নেয়া বাঙালির ঐতিহ্য। বাঙালির এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপরে প্রথম আঘাত করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তা, সেদিন বাঙালি মেনে নেয় নি সেই আঘাত, আর আজকের এই অতিমারিতেও বিঘ্নিত হলো বাংলা নতুন বছরকে বরণ করে নেয়ার উৎসব। বাধাগ্রস্থ হলেও বন্ধ হয়নি উদযাপন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অনলাইন প্লাটফর্মে আয়োজন করে বর্ষবরণের। দূরত্ব হবে শারীরিক, সামাজিক নয়। শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সামাজিকভাবে পাশে থাকাই হোক বর্তমানের ব্রত। এই ব্রতে রচিত হবে নতুন এক মানবতার ইতিহাস। ঈদ যেহেতু আনন্দ বয়ে আনে, সেই আনন্দ যেন বিষাদে পরিণত না হয়। একটি ঈদ সতর্কতার সাথে পালন করি যাতে পরবর্তী অনেক ঈদ সকল স্বজনকে পাশে নিয়ে উদযাপন করতে পারি। এই অতিমারিতে অনেকে হারিয়েছেন প্রিয়জন, অনেকে সহ্য করেছেন শারীরিক কষ্ট, মানসিকভাবে অনেকেই বিপর্যস্ত। আনন্দ আয়োজনে তারাও থাকুন আমাদের স্মরণে ও সঙ্গে।

সকলের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনায়।

মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা

রফিকুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পর থেকে পহেলা বৈশাখ নববর্ষবরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে। করোনা মহামারি বিশ্ববাসীর মতো বাঙালির জীবনও করেছে তছনছ। বৈশ্বিক এই দুর্যোগের সময় আমরাও অবরুদ্ধ, তবুও পুরনো বছরের জরাজীর্ণকে পেছনে ফেলে নতুন করে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্পে এ বছরেও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অনলাইনে জাদুঘরের ফেসবুক পাতায় আয়োজন করে নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এমপি বলেন, 'পয়লা বৈশাখ শুধু সংস্কৃতির অংশ হিসেবে নয় আমাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্বাধীনতার পরেও যখন আমরা সামরিক শাসনের কবলে পড়েছি, দেশে যখন স্বৈরশাসন সেই তখনও কিন্তু এই পয়লা বৈশাখ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধেরই জন্ম দিয়েছিল। জন্ম নিয়েছিল নতুন একটি ধারা মঙ্গল শোভাযাত্রা, যার সূচনা হয়েছিল যশোরে পরবর্তীতে ঢাকায় এবং প্রতি বছরই নতুন স্লোগান নিয়ে এই মঙ্গল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজকের দিনে আমরা যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন করছি এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছি সেই রকম একটি সময়ে পয়লা বৈশাখ একদিকে নতুন তাৎপর্য ও প্রতিরোধের প্রত্যয় নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।'

অনুষ্ঠানের আলোচক লেখক সাংবাদিক আবুল মোমেন বলেন, আমরা জানি যে, 'উৎসব' এর বাণীটিই হলো মানুষে মানুষে মিলন। সমাজে এমন অনেক শক্তি আছে বা অপশক্তি আছে যারা মানুষে মানুষে বিভেদ রচনা করে, মানুষের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে, সেই সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তি আমাদেরকে সব সময়ই একটা বিপথে বিপদে ধাবিত করে। ফলে করোনাকালে করোনার বিরুদ্ধে যেমন আমাদের সংগ্রাম তেমনি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ার যে সংগ্রামে আমরা বহুকাল ধরে যুক্ত আছি যার একটি অন্যতম সাংস্কৃতিক হাতিয়ার এই নববর্ষ উদযাপন।

জাদুঘরের অন্যতম সুহৃদ সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী মিতা হকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ২০২০ সালের জুলাই মাসে জাদুঘরের একটি অনুষ্ঠানে তার গাওয়া 'ভয় হতে তব অভয় মাঝে নূতন জনম দাও হে, ধারণকৃত গানটি উপস্থাপন করা হয়।

শিল্পী বুলবুল ইসলাম, অদিতি মহসিন ও শারমিন সাথী ইসলাম ময়না তাদের সঙ্গীত নিবেদনের আগে মিতা হকের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করেন। তারা গেয়ে শোনান 'আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও', 'ওরে নূতন যুগের ভোরে',

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

অতীত বর্তমান ও বিলীয়মান নির্জনতা

রণজিত রায়, *ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক*

সাত বছর আগে ইংরেজী ২০১৪ সালে আমি Docedge Kolkata-য় অংশগ্রহণ করি। উদ্দেশ্য ছিল আমার নতুন ডকুমেন্টারি ছবির জন্য কিছু অর্থ জোগাড় করা। 'মেন্টরিং' ব্যাপারটার সাথে এখানেই প্রথম পরিচয় হয়। 'মেন্টরিং' ঘটনাটা আসলে কী? সহজ করে যদি বলি এ অনেকটা একজন মানুষের সাথে প্রথম আলাপ এবং ধীরে ধীরে তাকে নিবিড়ভাবে চেনা। প্রথম আলাপে আমরা মানুষটির একটাই মুখ দেখি। যতদিন যায় তার আরও অন্য অনেক মুখ আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। মেন্টর-রা একটি মুখের পিছনে আরও অনেক মুখের আভাষ তুলে ধরেন। বোঝাতে চেষ্টা করেন প্রথম দর্শনের ভালবাসাটাই শেষ কথা নয়। আপাত অবয়বের বাইরে আরও অনেক কিছু আবিস্কার করার আছে। এতে অন্য অসুবিধাও আছে।

বিভিন্ন মেন্টর একই মুখের ভিন্ন ভিন্ন আভাষ তুলে ধরেন যা ডকুমেন্টারি চিত্র পরিচালকের মনে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। আমার বিশ্বাস স্থির চিত্তে যদি ভাবা যায় তবে রাস্তা ঠিক পাওয়া যাবে। সে রাস্তা চিত্র পরিচালককেই খুঁজে বের করতে হবে। কারণ শেষ পর্যন্ত ছবিটা মেন্টর-রা বানাবেন না, চিত্রপরিচালকই বানাবেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত Exposition of Young Talent 2021- এ মেন্টর হিসেবে সামিল হতে পেরে খুব

আনন্দিত হয়েছি। আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি কিন্তু জানি মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বহু জিনিষ এবং নথিপত্রের এক বিরাট সম্ভার সেখানে আছে এবং তা ক্রমবর্ধমান। জাদুঘর এমন একটি জায়গা যা ইতিহাসকে ধারণ করে।

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
তরুণ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতাদের উৎসাহ দান

জুবাইরিয়া আফরোজ বিনতি

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তরুণদের জন্য এক অনুপ্রেরণার নাম। সারাদেশ যখন করোনা নিয়ে সংকটে থমকে আছে তখন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্বাধীনতার এই ৫০তম বছরে সকল সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নিয়ে ভার্চুয়াল মাধ্যমে ৬-১০ এপ্রিল ২০২১ আয়োজন করে স্টোরি টেলিং ল্যাব ফর ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকার 'এক্সপোজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস ২০২১'।

মুক্তি ও মানবাধিকারের প্রতিপাদ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুরের নিয়মিত আয়োজন প্রামাণ্যচিত্র উৎসব লিবারেশন ডকফেস্ট-এর নবম আসর করোনা পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে স্থগিত হয়। তবে জাদুঘরের ট্রাস্টিবৃন্দের অনুপ্রেরণায় উৎসবটির প্রোজেক্ট ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

৫ দিনের ওয়ার্কশপে মেন্টর হিসেবে ছিলেন ডকুমেন্টারি রিসোর্স ইনিশিয়েটিভ-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত নির্মাতা বর্তমানে মনিপুর স্টেট ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট-এর ডিরেক্টর নীলোৎপল মজুমদার, ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা রণজিত রায় যিনি ২০১৪ সালে "ডকুমেনটেশন অব ক্লে ইমেজ মেকারস অব কামারটুলি" এবং ২০১৫ সালে "অ্যালং" প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের জন্য ভারতীয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার আসরে "রজত কমল" অর্জন করেন এবং বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাতা এন রাশেদ চৌধুরী।

ওয়ার্কশপে ১০ জন প্রজেক্টসহ অংশগ্রহণ করেন, তারা হলেন মকবুল চৌধুরী (সাইক্লিস্ট অব ওয়ার), মিজানুর রহমান (ফর দ্যা সেক অব ল্যান্ড), কাওসার মাহমুদ (ওয়ারিওরস উইদাউট উইপেন), রফিকুল আনোয়ার (সার্চিং রুটস- এন আর্টিস্টস টেল), জেরিন তাসনিম তাহসিন প্রভা (টিনডার ট্র্যাপ), অপরাজিতা সংগীতা (হাইড এন্ড সিক), মো: সামবিতুল ইসলাম (দ্য আনটোল্ড লাইভ্লিহুড), ব্রাত্য আমিন (কান্ট্রি এন্ড কোম্পানি), প্রাচেতা অহনা আলম (দ্যা পিপলস কোর্ট) এবং সায়েদ শাহরিয়ার হোসেইন (কমান্ডেন্ট মানিক চৌধুরী)। চারদিনের ল্যাব শেষে পিচিং সেশন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ফিল্ম প্রোডাকশন গ্রান্ট বিজয়ী হন কাওসার মাহমুদ (ওয়ারিওরস উইদাউট উইপেন) এবং রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট গ্রান্ট বিজয়ী হন যথাক্রমে মকবুল চৌধুরী (সাইক্লিস্ট অব ওয়ার), ব্রাত্য আমিন (কান্ট্রি এন্ড কোম্পানি) এবং মিজানুর রহমান (ফর দ্যা সেক অব ল্যান্ড)। এ ছাড়াও ওয়ার্কশপে অবজারভার হিসেবে ছিলেন মনন মুনতাকা শোভা, শরীফ রণি, সুস্মিতা সেন, জুবাইরিয়া আফরোজ বিনতি, পার্থ সেন গুপ্ত, আসাদুজ্জামান সরকার, সজিবুর রহমান, দুর্জয় চক্রবর্তী, লুৎফর রহমান ভুইয়া (সবুজ) এবং ইসতিয়াক আহমেদ।

এক্সপোজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস-এ পুরস্কৃত প্রজেক্ট

EXPOSITION OF YOUNG FILM TELENTS 2021

A Story Telling Lab for Documentary Filmmakers

FILM GRANT

PROJECT TITLE
WARIORS WITHOUT WEAPON

FILMMAKER
KAWSER MAHMUD

RESEARCH AND DEVELOPMENT GRANT

PROJECT TITLE
FOR THE SAKE OF LAND

FILMMAKER
MEZANUR RAHMAN

RESEARCH AND DEVELOPMENT GRANT

PROJECT TITLE
CYCLISTS OF WAR

FILMMAKER
MAKBUL CHOWDHURT

RESEARCH AND DEVELOPMENT GRANT

PROJECT TITLE
COMPANY DESH

FILMMAKER
MD.AMINUL HAQ BRATTO AMIN

ORGANIZED BY

IN COLLABORATION WITH

মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

'একী অপরূপ রূপে মা তোমায়'। লোকশিল্পী বিমান চন্দ্র বিশ্বাস 'কোন বা দ্যাশে রইলারে দয়াল চান' সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তিনি প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী ইন্দ্রমোহন রাজবংশীকে স্মরণ করে গান নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন স্পন্দন নৃত্য সংগঠনের নৃত্যশিল্পী নির্জনা দাশ প্রমা ও অরুণিমা সাহা।

পয়লা বৈশাখের এই আয়োজনে আবৃত্তিশিল্পী অনন্যা লাবণী পুতুল ও ইকবাল খোরশেদ জাফর যথাক্রমে শামসুর রাহমানের কবিতা 'বৈশাখের গান' এবং মুহম্মদ নূরুল হুদার কবিতা 'আকাশ গঙ্গায় ঘুরপাক' আবৃত্তি করেন। সবশেষে বাউল গান পরিবেশন করেন বাউল দেলোয়ার ও সোনিয়া।

সুপ্রাচীনকাল থেকে যে সকল উৎসব বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, রীতি-নীতি, প্রথা, আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কৃ-তিকে ধারণ করে পালিত হয়ে আসছে তার মধ্যে পহেলা বৈশাখ অর্থাৎ বাংলা নববর্ষ বাঙালির এক বৃহৎ সার্বজনীন উৎসব।

বাঙালির সহস্রাব্দের সংস্কৃতির পরিচয় বহনকারী অসাম্প্রদায়িক এ উৎসব দেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পথপরিক্রমণের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে আমাদের বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছে। পহেলা বৈশাখ বাঙালির জীবনে কেবল নববর্ষ উদযাপন নয়, এ এক সাংস্কৃতিক চেতনার জাগরণ। এ ভূখণ্ডের বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এ এক অন্যতম সাংস্কৃতিক উৎসব ও চেতনা।

ষাটের দশকে রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ উৎসব বাঙালির সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামসহ বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামকে বেগবান করেছে। নব্বই দশকের গোড়ার দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গণ থেকে বের হওয়া মঙ্গল শোভাযাত্রা নববর্ষ-উৎসবে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

২৪ ঘন্টাব্যাপী আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অংশগ্রহণ

গত ২৯ এপ্রিল, ২০২১ টুগেদার উই রিমেম্বার কোয়ালিশন সংগঠনটি বিশ্বব্যাপী গণহত্যা অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে ২৪ ঘন্টা জুড়ে এক ভার্চুয়াল সম্মেলন আয়োজন করে। সম্মেলনে বিশ্বের পঞ্চাশটি গণহত্যা জাদুঘর এবং প্রতিষ্ঠান, হংকং থেকে লস এঞ্জেলেস পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন টাইমজোনে তাদের স্ব স্ব উপস্থাপনা প্রদান করে।

উক্ত আয়োজনের অংশ হিসেবে ২৯ এপ্রিল, বাংলাদেশ সময় বেলা ১২ টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে : 50 Year's of Bangladesh Genocide: Forgetting and Remembering শিরোনামে এক ঘণ্টাব্যাপী ভার্চুয়াল আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) কোঅর্ডিনেটর নওরিন রহিম এবং দুজন স্বেচ্ছাসেবি গবেষক পৃথ্বি মাজবাহিন ও শারজিন জাহান বক্তব্য প্রদান করেন।

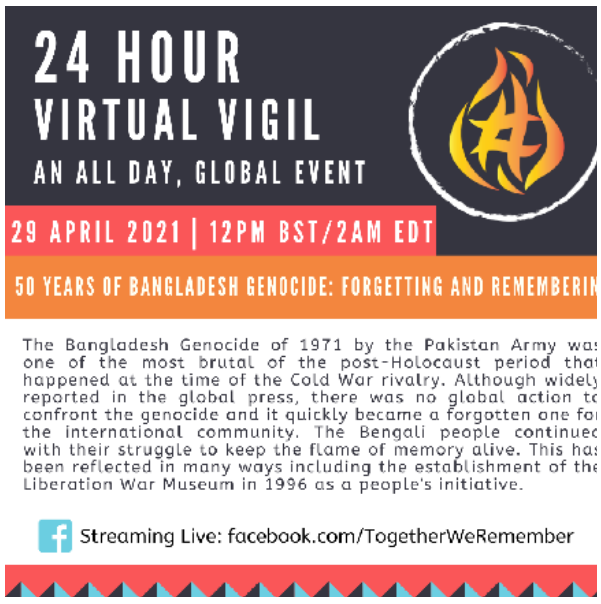

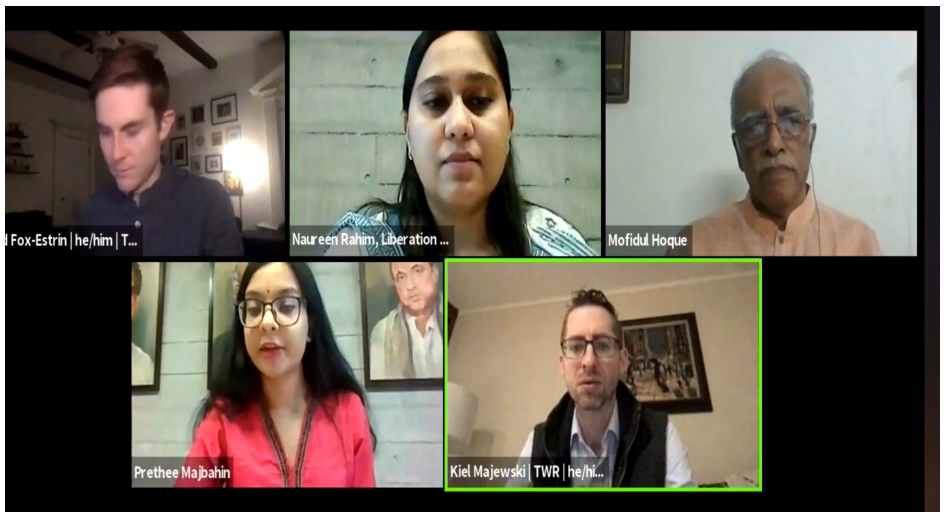

আলোচনার শুরুতেই জনাব মফিদুল হক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন এবং মূল আলোচনার জন্য তরুণ গবেষকদের আহবান জানান। মূল আলোচনায় প্রথম বক্তা হিসেবে পৃথ্বি মাজবাহিন বাংলাদেশের গণহত্যার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে সাতচল্লিশের দেশভাগ, সত্তরের নির্বাচনের কথা উল্লেখপূর্বক তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক বাঙালি জাতির উপর শোষণ নিপিড়নের চিত্র তুলে ধরেন। অপারেশন সার্চলাইটসহ বাংলাদেশের গণহত্যার নানা দিক উঠে আসে তার আলোচনায়। আলোচনার এক পর্যায়ে জহির রায়হান নির্মিত তথ্যচিত্র 'স্টপ জেনোসাইড'- এর কিছু অংশ অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে দেখানো হয়। পরবর্তীতে আলোচনার দ্বিতীয় বক্তা নওরিন রহিম এযাবৎকালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত নানা রকম কর্মকাণ্ডের উদাহরণস্বরূপ - মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য, আন্তর্জাতিক সম্মেলন, উইন্টার স্কুল, সার্টিফিকেট কোর্সের কথা উল্লেখ করেন। তিনি তুলে ধরেন ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কীভাবে ক্রমান্বয়ে গণমানুষের জাদুঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেল। এসময় তিনি জাদুঘরের নানা স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য, গ্যালারি, লাইব্রেরিসহ নানানরকম গবেষণা কর্মের কথাও মেলে ধরেন তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। গণহত্যা বিষয়ক নানা কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি '৭১-এর মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের লক্ষ্যে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে নানাভাবে সহযোগিতায় জাদুঘরের ভূমিকা এবং একাত্তরের যুদ্ধশিশু ও বীরাঙ্গনাদের কথাও তিনি উল্লেখ করেন তার আলোচনায়। আলোচনার তৃতীয় ও শেষ বক্তা হিসেবে শারজিন জাহান মিয়ানমারে সংগঠিত গণহত্যার শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমনের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক গৃহীত নানা কর্মকাণ্ডের বর্ণনা প্রদান করেন। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কক্সবাজারের উখিয়ায় নির্মিত রোহিঙ্গা শিবিরে ২০১৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ৬টি পৃথক ফিল্ড ভিজিট আয়োজন করে। এতে জাদুঘরের একদল স্বেচ্ছাসেবি গবেষক অংশগ্রহণ করে। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে দুটি পৃথক গবেষণা গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। শারজিন তার বক্তব্যে রোহিঙ্গা শিবিরে পরিচালিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ইউ এন উইমেন, এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটসের সাথে জাদুঘরের সম্মিলিত কার্যক্রমও তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে টুগেদার উই রিমেম্বার কোয়ালিশনসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভবিষ্যতে একসাথে কাজ করার প্রত্যয় ব্যাক্ত করা হয়। অনুষ্ঠানটি টুগেদার উই রিমেম্বার কোয়ালিশন-এর ফেসবুক এবং ইউটিউব পাতায় সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

ভার্চুয়াল সম্মেলন শেষে আয়োজক David Setting কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রেরিত বার্তা

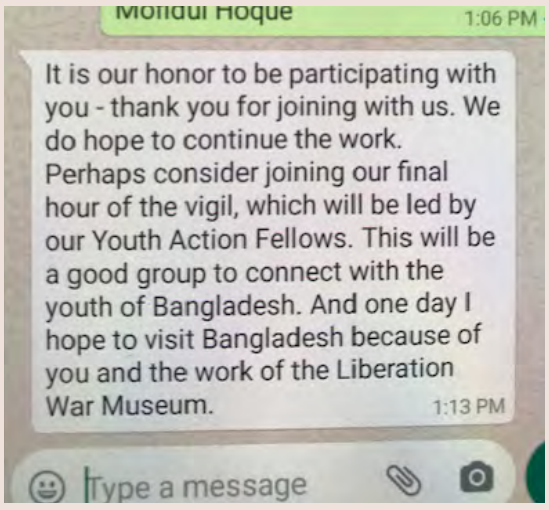

বাংলাদেশে সম্প্রীতি ও বিদ্বেষের রাজনীতি : আন্তর্জাতিক আলোচনা

নিউ ইয়র্কের ইনস্টিটিউট ফর স্টাডি অফ গ্লোবাল এন্টিসেমিটিজম অ্যান্ড পলিসি (আইএসজিএপি) সম্প্রীতি ও বিদ্বেষ বিষয়ে দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এক ওয়েবিনার সিরিজের আয়োজন করে। উক্ত বিষয়ে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞগণ এই ওয়েবিনার সিরিজে বক্তব্য প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৬ মে, ২০২১ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাতটায় সংগঠনটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি ওয়েবিনার আয়োজন করে। রিএক্সামিনিং সেকুলারিজম এন্ড এন্টিসেমিটিসম ইন বাংলাদেশ শীর্ষক ওয়েবিনারে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দি স্ট্যাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসের কোর্ডিনেটর নওরিন রহিম প্রধান বক্তা হিসেবে তার উপস্থাপনা প্রদান করেন। ওয়েবিনার সঞ্চালনা করেন আইএসজিএপি-এর রিসার্চ ফেলো ডা. নাভ্রাস জে আফ্রিদী।

নওরিন রহিম তার বক্তব্যের শুরুতে ইহুদি জনগোষ্ঠীর বাংলায় আগমন এবং অতীত ইতিহাসে তাদের অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন, তৎকালীন ব্যবসাখাতে ও শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের অবদান থাকলেও পরবর্তী সময়ে তারা উন্নত জীবনযাপনের জন্য দেশত্যাগ করেন এবং এই অঞ্চলে আর ফিরে আসেনি। পরবর্তীতে তিনি তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ইহুদি সম্প্রদায়ের দ্রুত বিলুপ্তির পেছনের কারণগুলি এবং তৎকালীন সময় থেকেই এই সম্প্রদায়ের প্রতি ইহুদিবাদ বিরোধী কোনো মনোভাব ছিলো কিনা তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে ইহুদিবাদ বিরোধী তেমন আলোচনা বা কর্মকাণ্ড চোখে পড়া দুষ্কর। কারণ এদেশের মানুষদের মধ্যে এমন দৃষ্টিভঙ্গি দৃশ্যমান নয় বরং এটি কেবল মুষ্টিমেয় রাজনীতিবিদ এবং ধর্মান্ধ উগ্রবাদী গোষ্ঠী দ্বারা অনুশীলন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী সময় থেকে দেশটি ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করে আসছে এবং সাংবিধানিক নিরাপত্তা প্রদানের ভিত্তিতে অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সংহতি প্রকাশ করে চলছে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে এখন পর্যন্ত ইহুদি বিরোধী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলেও বাংলাদেশ সরকারের ইসরায়েল বিরোধী অবস্থানের কথা উঠে আসে তার বক্তব্যে। এ প্রসংগে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে ইহুদিবাদবিরোধী বিষয়ে বাংলাদেশিদের দৃষ্টিভঙ্গি কোন রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হিসাবে নয় বরং রাজনৈতিক নীতির অংশ হিসাবে পরিলক্ষিত হয়। এসময় বিভিন্ন উগ্রবাদী গোষ্ঠীর দ্বারা সংঘঠিত ব্লগার হত্যা এবং জনসমাগমে হামলার বিষয়টিও উঠে আসে তার বক্তব্যে। বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে নওরিন রহিম গণহত্যা অধ্যয়নের জন্য সাম্প্রতিক সময়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং সিএসজিজের অবদানের কথাও উল্লেখ করেন।

উপস্থিত সকলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিলো। অনুষ্ঠানটি জুম মিটিং প্লাটফর্মের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে একাত্তরের এই মাস

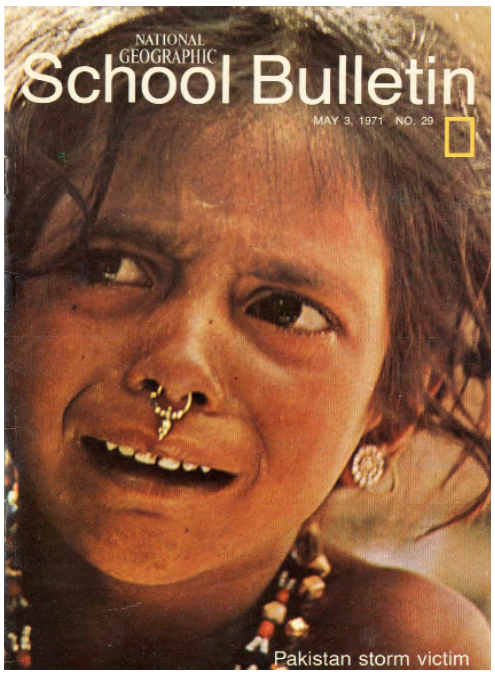

MORNING STAR : 4 MAY 1971

10

'Support Bangla Desh liberation struggle'

CALCUTTA, Monday.

THE CENTRAL committee of the Communist Party of East Pakistan (Bangla Desh) has called on "all democratic, peace and freedom loving forces as well as the Communists of the world to raise their voices in support of the Government of Bangla Desh."

14—EVENING STANDARD, WEDNESDAY, MAY 12, 1971

THESE five members of the Action Committee for Bangla Desh (the Lancashire and adjoining counties branch) are at Westminster loaded with 630 letters; one for each MP. The letters contain information about the alleged carnage in Bangla Desh which will be raised when East Bengal is the subject of a debate in the House on Friday. The debate will be opened by Mr. Bruce Douglas-Mann (Labour, North Kensington) with a motion calling on the Government to "use all its influence to secure a cease-fire in East Bengal." Because of House of Commons rules the five (left to right): M. Rahhman, Zahir Chowdri, Nazrul Islam, A. K. Kamaluddin and Latif Ahmed, could not deliver the letters personally so they had to be posted in the usual way.

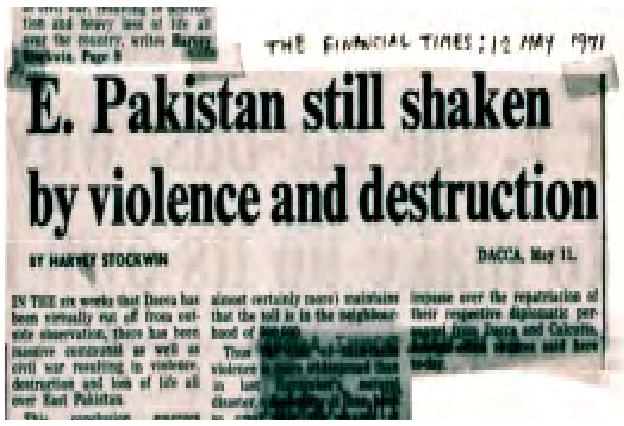
THE FINANCIAL TIMES ; 12 MAY 1971

E. Pakistan still shaken by violence and destruction

BY HARVEY STOCKWIN

DACCA, May 11.

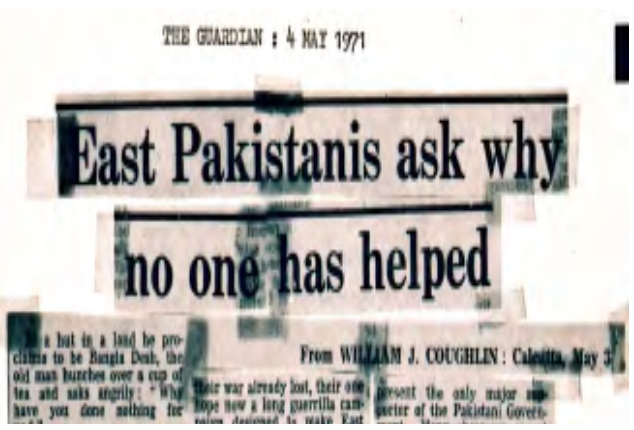
THE GUARDIAN : 4 MAY 1971

East Pakistanis ask why no one has helped

From WILLIAM J. COUGHLIN : Calcutta, May 3

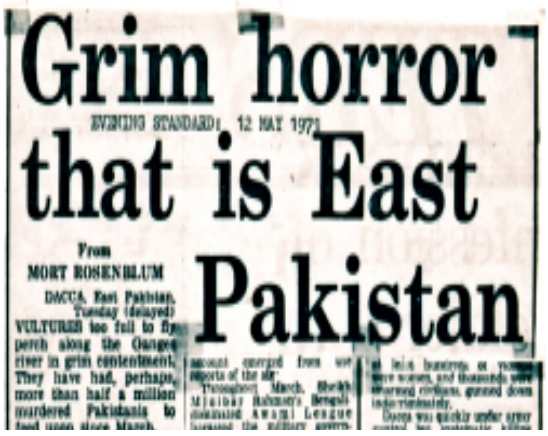
Grim horror that is East Pakistan

EVENING STANDARD, 12 MAY 1971

From MORT ROSENBLUM

DACCA, East Pakistan, Tuesday (delayed)

VULTURES too full to fly perch along the Ganges river in grim contentment. They have had, perhaps, more than half a million murdered Pakistanis to feed upon since March.

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিদায় শামসুজ্জামান খান

বাংলাদেশের কৃতি সন্তান, জাদুঘরের পরম সুহৃদ

শামসুজ্জামান খান অনেক পরিচয়ে নন্দিত মানুষ, যেমন তাঁর কর্মের বিস্তার তেমনি মেধা, মনন ও ইতিহাস-দৃষ্টি নিয়ে সমাজ-বিশ্লেষণে তাঁর দক্ষতা ও অবদান। তাঁর চিন্তাশীল লেখালেখির প্রধান দিক ছিল বাঙালির জাতীয় চেতনা, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু, যা তিনি বিচার করেছিলেন অন্যতর মাত্রায়। বাঙালির মানসলোকে কীভাবে মিলন-মিশ্রণ- সম্প্রীতির আদর্শ নিয়ে উদারবাদী মানস বিকশিত হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাস্তব ঘটনাধারা বিশ্লেষণে তিনি সর্বদা ছিলেন আগ্রহী। একই সাথে লোক-সংস্কৃতি বিচারে তিনি ছিলেন খ্যাতমান ব্যক্তিত্ব, যে স্বীকৃতি পেরিয়ে গিয়েছিল দেশের সীমানা। ভারত ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের লোকসংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্রে তিনি ছিলেন সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি মেলে ধরেছেন বিশ্বের কাছে, আবার বিভিন্ন দেশের কৃতিমান ফোকলরিস্টদের নিয়ে এসেছেন বাংলাদেশে। লোকসংস্কৃতি-চর্চাকে তিনি বিপুলভাবে প্রসারিত করেছেন, দিয়েছেন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ এবং প্রণোদনা যুগিয়েছেন তরুণতর গবেষকদের।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রাণের বন্ধনে যুক্ত ছিলেন শামসুজ্জামান খান। তাঁরই যোগ্য সহযোগী মোহাম্মদ সাইদুর বাংলা একাডেমির কর্মকাল শেষে স্বেচ্ছাকর্মী হিসেবে জাদুঘরের স্মারক সংগ্রহে দেশময় ঘুরে বেড়ান। এই কর্মযজ্ঞের পেছনে প্রেরণাদাতা ছিলেন শামসুজ্জামান খান। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে তিনি প্রদান করেছেন মীর মোশাররফ হোসেন-এর সহধর্মিণী বিবি কুলসুমের রোজনামচা, যা বাঙালি সমাজে অবহেলিত বঞ্চিত নারীদের নিজস্ব বয়ানের এক আদি উদাহরণ। জাদুঘরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তিনি উৎসাহ নিয়ে যুক্ত হতেন, একাধিকবার তিনি বিশেষ ভাষণ প্রদান করেছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে, অবদান রেখেছেন সমাজ ও ইতিহাস-চেতনা প্রসারে। করোনা-কালে শামসুজ্জামান খানের প্রয়াণে দেশ হারিয়েছে তাঁর এক কৃতি সন্তান। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার পরম সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ীকে জানায় বিদায়।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চতুর্দশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ২২ মার্চ ২০১০ বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান 'মুক্তবুদ্ধি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রনীতি' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেণ। বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। ভিন্ন ভিন্ন আচার-বিশ্বাস-সংস্কার-ধর্মমত ও সাধন পন্থায় বিশ্বাসী নানান আদিম জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত বাঙালি জাতির মূল বৈশিষ্ট্য যে পরমত সহিষ্ণুতা সেটির বিশ্লেষণে তিনি বলেন 'এত বিচিত্র জীবনযাত্রা ও ঐতিহ্যের মানবগোষ্ঠীর জীবন পদ্ধতি নির্ধারণ এবং যাপিত জীবনকে সহনীয় করার লক্ষ্যে যে কোন বিরোধ বা অলংঘনীয় বাধার সৃষ্টি হয় নি বা সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষ্যে সমন্বিত জীবনধারা গড়ে উঠেছে সেটিই আমাদের পূর্বপুরুষদের বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে। যাপিত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির জন্য এ ধরণের গ্রহণক্ষম ও মিলিত জীবনযাত্রার বোধ আমাদের প্রাচীন বংশধরদের এক অসামান্য কীর্তি।' আর এই সম্মিলিত জীবনের মধ্য দিয়ে কৌম সমাজগুলো যে সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সৃষ্টি করেছে তাকেই তিনি বাঙালির জীবন বলে আখ্যাত করেছেন। আদিম কৌম সমাজ থেকে শুরু করে প্রাচীন যুগের বিভিন্ন শাসনকাল, মধ্যযুগের মুসলিম শাসন কাল পর্যন্ত পর্যালোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে কেবল সমাজ সংস্কৃতিই নয় বরং রাষ্ট্রশাসন ও গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেও এই সমন্বয় চিন্তন একান্ত প্রয়োজন, তার ভাষায়, 'ইতিহাস আমাদের কী শিক্ষা দেয়? শিক্ষা তো এটাই যে, বিশেষ কোনো ধর্ম বা প্রচন্ড শক্তিশালী রাজতন্ত্র জনগণের সমস্যার কোন সমাধান দিতে পারে না। বিকল্প পন্থা হিসেবে সংলাপ, সমন্বয় এবং ধর্মকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্থিত রেখেই সাধারণ মানুষের কল্যাণমূলক রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলা সমীচীন।' গণতন্ত্রের এক ধরণের অনুশীলনের ফলেই পাল আমলে শিল্প-সংস্কৃতি-চিত্রকলা-ভাস্কর্যেও অসামান্য বিকাশসহ বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটেছিল বলে তিনি দেখিয়েছেন, বিপরীতে পাল পরবর্তী সেন যুগে উগ্র ধর্মীয় শাসনের ফলে এবং সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রীয় ধর্ম-দর্শনের বিকাশকে প্রাধান্য দেবার ফলে বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ ব্যহত হয়েছে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করেন, 'ধর্ম-নিরপেক্ষতার ফলে সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতি আর শিল্প-সংস্কৃতির অপূর্ব বিকাশ ঘটে এবং ধর্মান্ধতা এমনকি ধর্ম-প্রবণতার ফলেও সামাজিক বিপর্যয় ও সংস্কৃতিক অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়'। বাঙালির এই ধর্মনিরপেক্ষ জীবন চর্চায় গ্রামাঞ্চলের বাউল বৈষ্ণব, সুফি সাধক, নাথযোগী, বৌদ্ধ-জৈনদের অবদান তিনি তুলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, 'মানবপন্থী বাংলাদেশ প্রাচীনকালেও ভারতের শাস্ত্রপন্থী সমাজ নেতাদের কাছে নিন্দনীয় ছিল। তীর্থযাত্রা ছাড়া এখানে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। তার মানে বাংলাদেশ চিরদিনই শাস্ত্রগত সংস্কারমুক্ত।'

ভুলি নাই শহীদের কোন স্মৃতি/ ভুলব না কিছুই আমরা

রণদা প্রসাদ সাহা

(১৫ নভেম্বর ১৮৯৬ - ৭ মে ১৯৭১)

আর পি সাহা এই নামেই দেশ-বিদেশ জুড়ে পরিচিত তিনি। জন্ম মামা বাড়ি মানিকগঞ্জে। শৈশবে মাতৃ হারা হয়ে অভাব-অনটনের জীবন থেকে মুক্তি পেতে কলকাতায় যেয়ে কায়িক শ্রমের কাজও করেন। বৃটিশ রাজকীয় সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইরাকে যুদ্ধ করেন। ১৯১৯ সালে বেঙ্গল ইনফ্যান্ট্রি/ বাঙালি পল্টন-এর প্রতিনিধি হিসেবে লন্ডনে আয়োজিত বিজয় কুচকাওয়াজে আমন্ত্রিত হন এবং সাহসিকতার জন্য 'সোর্ড অব অনার' লাভ করেন।

যুদ্ধ-ফেরৎ জীবনে তিনি ব্যবসা শুরু করে ক্রমে সম্পদশালী হয়ে ওঠেন। অর্জিত সম্পদ নিবেদন করেন মানবসেবায় এবং চিকিৎসালয়, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণসহ বহু জনহিতকর কর্মকাণ্ডের জন্য 'দানবীর' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে ১৯৪৪ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কুমুদিনী হাসপাতাল উদ্বোধন করেন বাংলার গভর্নর লর্ড কেসি। মেয়েদের আবাসিক বিদ্যালয় হিসেবে ভারতেশ্বরী হোমস যাত্রা শুরু করে ১৯৪৫ সালে। আরো অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনহিতকর কাজের তিনি উদ্যোক্তা।

আর পি সাহাকে জেনারেল রাও ফরমান আলী গভর্নর হাউসে ডেকে পাঠান ২৯ এপ্রিল ১৯৭১। তিনি পুত্র ভবানী প্রসাদ সাহা-সহ সেখানে যান এবং সপ্তাহকাল আটক থাকেন। ৫ মে ফিরে এলেও দুইদিন পর নারায়ণগঞ্জের আবাস থেকে পিতা-পুত্র অপহৃত হন এবং আর তাঁদের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ভবানী প্রসাদ সাহা (১ জানুয়ারি ১৯৪৪ - ৭ মে ১৯৭১)

ঢাকার নটরডেম কলেজ থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পড়াশোনার পাশাপাশি পারিবারিক ব্যবসার কাজে যুক্ত হন। ১১ মে ১৯৬৭ ভবানী প্রসাদ (রবি) সিলেটের শ্রীমতী সাহার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরের বছর ২৬ মার্চ তাঁদের পুত্র রাজীব প্রসাদের জন্ম। ৭ মে ১৯৭১ পিতা রণদা প্রসাদ সাহার সাথে রবিকেও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তুলে নিয়ে যায় এবং তাঁরা আর ফিরে আসেননি।

স্বপ্নের পথে হাঁটার সাথী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

কাওসার মাহমুদ, *প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা*

নব্বই দশকে প্রিন্ট মিডিয়ায় আমার লেখালেখি, সাংবাদিকতার শুরু। আজকের কাগজ, বাংলাবাজার পত্রিকায় রির্পোটিং দিয়ে হলেও শেষটা হয়েছে মানব জমিনে ফিচার বিভাগে। কিন্তু তখন মনের গহীনে আরেকটি স্বপ্ন উঁকি দিলেও কখনো পাখনা মেলেনি। সেসময় নিয়মিত ধ্রুপদী চলচ্চিত্র দেখার এক নান্দনিক প্রভাব পড়েছিল। বিশেষ করে প্রয়াত চলচ্চিত্রকার আবদুস সামাদ স্যার যখন রাশিয়ান কালচারাল সেন্টারে পৃথিবীর নানান ক্লাসিক সিনেমার ঝাঁপি খুলে বসতেন তখন ভেতরে এক সুপ্ত বাসনা খলবলিয়ে উঠত। আলো-আঁধার ঘর, ফিল্ম প্রোজেক্টরের গরগর শব্দ, সব মিলিয়ে আমার ভেতর এক নতুন দুনিয়ার জন্ম নিল। সামাদ স্যার যখন সের্গেই আইজেনস্টাইনের অনবদ্য সৃষ্টি 'ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন'-এর প্রতিটা শটের জ্যামেতিক কাঠামো এবং অভিনয়শৈলী নিয়ে কথা বলতেন তখনো বুঝিনি "Larger than Life"-এর স্বপ্নিল জগত আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

প্রিন্ট মিডিয়া থেকে ভিজুয়াল মিডিয়ায় প্রবেশ ২০০০ সালে। একুশে টিভিতে। স্বপ্নের পেখম মেলতে শুরু করে এখানেই। দেশের এক ঝাঁক তরুণ তখন প্রতিদিনকার বাস্তব পৃথিবীর গল্প বলায় বিভোর। আমিও আশার দ্বীপে আলো জ্বালিয়ে দিলাম। আড়ালে আবডালে নানা কিছু নির্মাণ করে হাত পাকানোর চেষ্টা করছি। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কেটে গেলো অনেক বছর। ক্যামেরার সামনে আর পেছনে রকমারি মানুষের গল্প বললেও নিজের গল্প বলতে পারিনি। ওই যা হয়। ঘর-সংসারের চাপে বেচারা স্বপ্নরা ছোট হতে থাকে। কিন্তু স্বপ্ন বাড়ন্ত না হলেও বামন হতে দেইনি। আজ থেকে প্রায় ১২ বছর আগে এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রার সূচনা করেছিলাম। গল্প বলায় কেন জানি আমাকে মহান মুক্তিযুদ্ধ প্রবলভাবে টানে। মুক্তিযুদ্ধের বেদনার গল্প আমরা যতটা শুনি, বীরত্বের গল্প ততটা শুনি না। আবার রণাঙ্গনের গল্প শুনলেও, অস্ত্রবিহীন লড়াইয়ের গল্প শোনা হয় না। আমি মুক্তিযুদ্ধে এক অন্যরকম যোদ্ধাদের গল্প বলতে মনস্থির করলাম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধাদের গল্প। শুধু শব্দ আর কণ্ঠ দিয়ে কীভাবে পাকিস্তানি জান্তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে একদল রেডিওকর্মী? স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কালজয়ী সব গান কখনো আমাদের স্মৃতি থেকে, হৃদয় থেকে মুছে যাবে না। কিন্তু কোন চেতনা শক্তিতে জেগে উঠেছিল একদল শব্দসেনা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাকে পাড়ি দিতে হয়েছে অনেক চড়াই উতরাই পথ। পথে নেমে বুঝিনি পথ কতটা বন্ধুর।

সময় আর নির্মম বাস্তবতার কারণে অধিকাংশ কণ্ঠযোদ্ধা আড়ালে আছেন। কেউ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। রাজনীতির পটপরিবর্তনের কারণে কেউ কেউ আবার ক্যামেরার মুখোমুখি হতে অস্বস্তি বোধ করেছেন। যাহোক, অবশেষে স্বাধীন বাংলা বেতারের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা বেলাল মোহাম্মদ কথা বলতে শুরু করলেন, ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করলো ইতিহাসের না বলা গল্প। টান টান উত্তেজনায় আমরা শুনতে থাকলাম কণ্ঠযোদ্ধাদের দুর্ধর্ষ অভিযান। গোলা-বন্দুকবিহীন এক অসামান্য যুদ্ধ। গান-কবিতা কিংবা সংবাদ কীভাবে অস্ত্রের বিকল্প হিসেবে শত্রুকে বধ করতে পারে, এরকম দৃষ্টান্ত বোধকরি যুদ্ধের ইতিহাসে বিরল। বেলাল ভাইকে নিয়ে ছুটে চললাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে যেখানে সূচনা হয়েছিল বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র। সরেজমিনে গেলাম পটিয়া মাদ্রাসা, বাগাফা সীমান্ত, আগরতলা এবং সবশেষে কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ি 'গুপ্ত হাউস'। এই বাড়িতেই স্বাধীন বাংলা বেতারের সফল সমাপ্তি ঘটে। ইতিহাসকে ফিরে দেখার প্রচেষ্টায় কেটে গেলো অনেক বছর। পেশাগত কাজের ফাঁকে সম্পাদনার কাজও চলতে থাকে, কিন্তু মনে হল কোন কূল কিনারাহীন সমুদ্রে ডিঙ্গি ভাসিয়েছি। কিনার পাবার আশায় সুহৃদদের পরামর্শ চলতে থাকলো। কিন্তু বুঝতে পারলাম, এতো বৃহৎ পরিসরের এই কাজে আমার গাইড দরকার। সঠিক নির্দেশনা দরকার। যে নির্দেশনায় দরকারি ফুলে আমি একটি মালা গাঁথতে পারবো। স্যোশাল মিডিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত ফিল্ম ওয়ার্কশপ "Exposition of Young Film Talent 2021" শিরোনামের একটি বিজ্ঞপ্তি নজরে এলো। তখনো ওয়ার্কশপের আদি-অন্ত জানতাম না। আমি কখনো এরকম কোন কর্মশালায় যোগ দেইনি, যেখানে নিজের প্রজেক্টের জন্য পিচ করতে হয়। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, লগ লাইন, সামারি কিংবা সিনপসিস লেখার মুন্সিয়ানাও আমার নেই। একরকম দ্বিধা আর সংকোচ নিয়ে আবেদন করলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের না বলা গল্প নিয়ে আমার প্রথম ফিল্ম Warriors Without Weapon. যার বাংলা টাইটেল 'শব্দসেনা'। আবেদনটি নির্বাচিত হওয়ায় আগ্রহের পারদ আরও ওপরে উঠে গেলো।

৫ দিনব্যাপী কর্মশালাটি আমার ভেতরের দরোজা-জানালা খুলে দিলো। বিশ্বব্যাপী ডকুমেন্টরি ফিল্মের চলমান গতিধারা তো বটেই, একটি ধারনা ডালপালা ছড়িয়ে কীভাবে বৃক্ষে পরিণত হয় তা অনুধাবন করা গেছে কর্মশালার প্রতিটি সেশনে। একজন আগন্তুক ফিল্ম মেকারের জন্য এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আর কিছু হতে পারে না।

একজন নবীনের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকে, কিন্তু দিন শেষে প্রত্যেক প্রতিযোগী সম্ভাবনাই দেখতে পান। অন্তত আমি দেখতে পেরেছি। মেনটরদের টেবিলে আইডিয়া মেলে ধরতেই পাকা জহুরীর মত পরখ শেষে যে নির্দেশনা আসে তার প্রাপ্তি এক মোহন আনন্দ। বোনাস পাওনা ছিল ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিক্ষক নীলোৎপল মজুমদার, ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা রণজিৎ রায়। স্বনামধন্য এই দুজনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আর নবীনদের প্রতি মমতাময় দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের মনোবল করেছে অনেক চাঙ্গা। সেইসাথে বাংলাদেশী চলচ্চিত্র নির্মাতা রাশেদ চৌধুরীর অংশগ্রহণ আমাদের দিয়েছে এক অন্যরকম প্রশান্তি। শেষদিনে আমার চলচ্চিত্রটি নিয়ে মফিদুল হক ভাইয়ের পরামর্শ পাথেয় হয়ে থাকবে।

একটি সৃষ্টির সফল পরিণতির পেছনে তারেক আহমেদ এবং শরিফুল ইসলাম শাওনের ক্লান্তিহীন সমন্বয় আমাদের মনোবল সুদৃঢ় করেছে। কর্মশালার শেষ দিনের চমকটি আমার জন্য ছিল এক বড় প্রাপ্তি। নিয়ম অনুসারে কর্মশালায় সবগুলো প্রজেক্টের পিচিং শেষে দুটি বিভাগে ফিল্ম গ্রান্ট ঘোষণা করা হয়। প্রথম বিভাগেই Warriors Without Weapon-এর নাম ঘোষণা আমার কাছে একই সাথে বিস্ময় আর অনুপ্রেরণাময়। এই প্রাপ্তির চেয়ে সবচে বড় প্রাপ্তি হল একদল সৃষ্টিশীল মানুষদের সাথে স্বপ্ন নিয়ে কথা বলা। স্বপ্নের পথে একাকী হাঁটতে গিয়ে যখন সমমনা পথিকের দেখা পাওয়া যায়, তখন পথ আর কঠিন মনে হয় না। মহান মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আমার পাশে থাকবে এর চাইতে বড় প্রাপ্তি বা পুরস্কার আর কী হতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর : জাতীয় চেতনার বাতিঘর- সুহৃদ জাহাঙ্গীর

১৯৭১। মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ৫ সেগুন বাগিচা ঢাকা। চেতনার বাতিঘর।
প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে প্রথম যাই সেখানে। উদ্দেশ্য একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধার প্রায় ৬ ফুটের মতো উঁচু ভাস্কর্য জাদুঘরকে হস্তান্তর করা। পরিচিত হলাম মহানুভব ৮ জন ট্রাস্টির অন্যতম একজন জনাব আক্কু চৌধুরীর সঙ্গে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমার দায়বদ্ধতা থেকেই বিষয়টি বিস্তারিত বললাম তাঁকে। তিনি সানন্দে সাগ্রহে হাসি মুখে বললেন, চমৎকার প্রস্তাব। আন্তরিকভাবে জানালেন, আপনি শুধু কষ্ট করে ঢাকায় নিয়ে আসেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কৃতার্থ হবে। কিন্তু অনিবার্য কারণে তা জাদুঘরে পৌঁছাতে পারিনি।
দিনক্ষণ সন তারিখ মনে নেই। তবুও প্রসঙ্গত বিষয়টি বয়ানযোগ্য, সেবারে প্রথম সৌজন্য সাক্ষাৎ ঘটে গবেষক ও প্রাবন্ধিক মফিদুল হক, দেশবরেণ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ড. সন্‌জীদা খাতুনের সঙ্গে শেরপুর সার্কিট হাউসে। তাঁরা এসেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের কোন একটি অনুষ্ঠানে। আলাপচারিতার এক পর্যায়ে ঘনিষ্ঠতার কণ্ঠে মফিদুল ভাই আমাকে বললেন, চলো সুহৃদ, তোমাদের শেরপুর শহরটি ঘুরে দেখবো। আমি তথৈবচ। জমিদারদের স্মৃতি সম্বলিত স্থানগুলো পরিদর্শন প্রসূত অভিজ্ঞতার আলোকে একটি তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ রচনা করেছিলেন তিনি।
ইতোমধ্যে বাংলা একাডেমির মতোই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাংলাদেশের ঠিকানা তথা জাতীয় চেতনার বাতিঘর হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়- আমার দেখা ও জানা মতে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যেন একটি জাতীয় পরিবার। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সম্পৃক্ত হলাম জাদুঘর পরিবারের সাথে, তাঁদের কার্যক্রমের সাথে। বিশেষ করে মফিদুল ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ চলছিল। তাছাড়া কারণে অকারণে চলছিল নিত্য আসা-যাওয়া জাদুঘর প্রাঙ্গনে। ডা. সারওয়ার আলী ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর কক্ষে বসা। জাদুঘর থেকে প্রকাশিত মাসিক দেওয়াল পত্রিকার কাজে নিয়োজিত হাসান আহমদ ভাইয়ের সদালাপের মধ্য দিয়ে অনেকটা সময় পার করে দুপুরের খাবার খাওয়ার আন্তরিক মুহূর্তগুলো আমার অভিজ্ঞতার পৃষ্ঠাকে সমৃদ্ধ করেছে।
মাঝে মধ্যে জাদুঘর ক্যান্টিনে চায়ের আড্ডায় সত্যজিত রায় মজুমদার, রফিকুল ইসলাম, রঞ্জন কুমার সিংহ, আমেনা খাতুন, নাসির উদ্দিন, আব্দুল মতিন, মামুন সিদ্দিকী প্রমুখ মিলে বারোয়ারী আড্ডায় রকমারি কড়চায় অর্জিত জ্ঞানের সুদুর প্রসারী চেতনা জগতের দ্বার উন্মোচন করেছে। এখন আমার ব্যক্তি জীবনকে আলোকিত করেছে। জাতীয় প্রেস ক্লাবের 'সিরডাপ' মিলনায়তনে নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনীতে অতিথি হিসেবে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ, সম্মানিত ট্রাস্টি সারা যাকেরের সাবলীল-শৈল্পিক সঞ্চালনায় দেশের বরেণ্যজনের আলোচনায় মহান মুক্তিযুদ্ধের আদি-অন্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে সম্যক ধারনা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমাকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে।
এখানে উল্লেখ্য যে, ২০০৪ সনে ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর শেরপুরের সীমান্তবর্তী আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা ঝিনাইগাতী উপজেলার রাংটিয়া হাই স্কুলে অনুষ্ঠান পরিচালনাকালে ট্রাস্টি মফিদুল হকের সঙ্গে হাসান আহমদ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে আমাকে নিয়ে গজনী অবকাশ কেন্দ্র ভ্রমণের পথে মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু, সমকালীন রাজনীতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। এরকম সুর্বণ সময়গুলো আমার স্মৃতির এ্যালবামে উজ্জ্বল আলোকচিত্রের মতো ভাস্বর থাকবে। এক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় ঘটনা হলো মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী শহীদ তথা শহীদ পরিবারের প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কতটা দায়বদ্ধ তার প্রমাণ মেলে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলীর পরিবারের প্রতি অকৃপণ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে। ২০০৪ সনের ঘটনা, মফিদুল হক একটি বিশেষ সূত্রে জানতে পারেন যে, নালিতাবাড়ী (শেরপুর) উপজেলার কালাকুমা গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলীর বাবা, ভাই ও বোনসহ ৪ জন সদস্যকে পাক হানাদার বাহিনী গুলি করে হত্যা করে। সংবাদটি তাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। বিষয়টি তিনি আমার সঙ্গে শেয়ার করেন। পরবর্তী সময়ে হাসান আহমদ-সহ শেরপুর এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে কালাকুমার উদ্দেশে রওনা দেন। নাকুগাঁও বাজারে মুক্তিযোদ্ধা উচ্চ বিদ্যালয়ে আমাদের গাড়িটি রেখে, স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্র/ছাত্রীদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা শেষে কালাকুমা নদী নৌকা যোগে পার হই এবং ৪-৫ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে শহীদ ইদ্রিস আলীর বড় ভাই চেঙ্গু মিয়ার বাড়ি খুঁজে পাই। সেখানে তাদের সঙ্গে পরিবারিক হাল অবস্থা, আয় উপার্জনের বিষয়টি অবগত হই। গ্রামের লোকজনের কাছে এই শহীদ পরিবারের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করি। চেঙ্গু মিয়াকে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে আমরা সেবারের মতো চলে আসি।
সেদিনের দেয়া প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শহীদ ইদ্রিস আলীর পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতার জন্য অগ্রণী ব্যাংকের একটি চেক প্রেরণ করে। সেই টাকায় আমি ঐ পরিবারকে ২টি গাভী, ২টি রিক্সা কিনে দেই। এরপরে চেঙ্গু মিয়ার মেয়ের বিয়ে বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এখানেই মানবিক মূল্যবোধের ধারক বাহক মানবতার কাজে নিবেদিত। অশেষ অবদানের আরও একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ট্রাস্টি জিয়াউদ্দিন তারিক আলীর মহৎ উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিবেদিত-'অদম্য কিশোরদের গল্প' শিরোনামে যথাক্রমে বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: আবু সালেহ ও মো: জাহাঙ্গীর আলম (সুহৃদ জাহাঙ্গীর) এর উপর একটি প্রমাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়। ভাষ্যকার হিসেবে কণ্ঠ দেন আবৃত্তিকার রফিকুল ইসলাম। পরিচালক হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে নির্মাণ কাজটি সম্পন্ন করেন-তন্ময় মণ্ডল তপু।
সময়ের সাহসী সন্তান ৮ জন মহৎ ব্যক্তির তিলতিল শ্রম আর ঘামে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে রাজধানীর আগারগাঁও-এ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটির সুবিশাল নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে এই জাদুঘর। দুঃখের বিষয় এই যে, এই মহান প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন ট্রাস্টি, কর্মকর্তা, কর্মচারী ইতোমধ্যে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। জাতির এই কর্মবীর সন্তানদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। কামনা করি, তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি সুখ।

নেটওয়ার্ক শিক্ষক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
এবং সহকারী অধ্যাপক (বাংলা) আলহাজ শফিউদ্দিন আহম্মদ কলেজ, ঝিনাইগাতী

মুক্তিযুদ্ধে জামালপুর ও শেরপুর জেলার স্মৃতিময় স্থান

গোটা বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য স্মৃতিবিজড়িত স্থান। প্রোগ্রাম অফিসার (রিচ আউট) রঞ্জন কুমার সিংহ ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিয়ে জামালপুর ও শেরপুর জেলা পরিভ্রমণ করে তুলে এনেছেন এমন কিছু স্থানের পরিচিতি–

পানি উন্নয়ন বোর্ড রেস্ট হাউস : পাকিস্তানী বাহিনী এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে জামালপুর জেলা দখল নেয়ার পর পানি উন্নয়ন বোর্ড-এ ক্যাম্প স্থাপন করেন। পাকিস্তানী বাহিনী পানি উন্নয়ন বোর্ড রেস্ট হাউসকে আবাসন এবং পিটিআই পুরুষ হোস্টেলকে প্রধান নির্যাতন কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করে। এখানে রাজাকারের সহায়তায় আশেপাশের এলাকা ছাড়াও সরিষাবাড়ি, ধনবাড়ি ও মধুপুর এলাকা থেকে নিরীহ লোকদের ধরে এনে অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেস্ট হাউসের পিছনের ডোবায় মাটি চাপা দেয়া হত। এখন মুক্তিযুদ্ধের নীরব সাক্ষী হয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেস্ট হাউসটি দাঁড়িয়ে আছে।
সাধনা ঔষধালয় : মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী বাহিনীর সহায়তায় রাজাকার বাহিনী সাধনা ঔষধালয়টি দখলে নিয়ে সেখানে বদর বাহিনীর অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করে।
জগন্নাথগঞ্জ ঘাট ক্যাম্প : মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী বাহিনী নদীপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা দখলে রাখার জন্য জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে সরিষাবাড়ি এলাকার বৃহৎ ক্যাম্প স্থাপন করে। পাকিস্তানী বাহিনী এই ক্যাম্প থেকে নদীপথে ও সড়ক পথে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতো। দেশ স্বাধীনের পর ক্যাম্পটি রেলওয়ে শ্রমিকরা সংগঠনের কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করছেন।
আশেক মাহমুদ কলেজ হোস্টেল (ইন্টারমিডিয়েট) : আশেক মাহমুদ কলেজের প্রসাশনিক ভবনের কাছেই ইন্টারমিডিয়েট হোস্টেল। মুক্তিযুদ্ধের সময় কুখ্যাত রাজাকার কমান্ডার আশাফ আলীর নেতৃত্বে পুরুষ হোস্টেলটিতে

নির্যাতন কেন্দ্র স্থাপন করে। আশ্রাফ আলীর নির্দেশে রাজাকার মান্নান, বারীসহ অন্যরা নিরীহ লোকদের ধরে এনে হোস্টেলে নির্যাতন চালাতো। পাশাবিক নির্যাতনে মৃতদের হোস্টেলের পাশের ডোবায় ফেলে দিত আর অর্ধমৃত দের ফৌতি গোরস্থানের নিচু এলাকায় ফেলে মাটি চাপা দেয়া হত। আজ স্থানীয় লোকজন হোস্টেলটিকে গোশালা হিসাবে ব্যবহার করছে।
কোয়ারি রোড ইউনিয়ন পরিষদ ভবন : পাকিস্তানী বাহিনী শেরপুর দখল নেয়ার পর শহরের পাশাপাশি ঝিনাইগাতি উপজেলার মালিঝিকান্দা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন ও আহমদনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্যাম্প স্থাপন করে। উল্লেখ্য যে কাটাখালী ব্রীজ ধ্বংসের পর

খাটুয়াপাড়া গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর আক্রমণে প্রধান ভূমিকা রাখে কোয়ারি রোডে অবস্থিত এই ক্যাম্পটি। বর্তমানে পূর্বের ভবনগুলো ভেঙ্গে নতুন করে নির্মিত করা হয়েছে কিন্তু নতুন ভবনের পাশে এখনও সেই সময়ের ব্যবহৃত একটি ভবন অক্ষত অবস্থায় আছে। মুক্তিযুদ্ধের নীরব সাক্ষী অক্ষত এই ভবনটিকে সংরক্ষণের জন্য মালিঝিকান্দা ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান এবং শেরপুর জেলা প্রশাসককে বিষয়টি অবগত করা হয়েছে।
আহমদ নগর উচ্চ বিদ্যালয় ক্যাম্প : আহমদ নগর উচ্চ বিদ্যালয়ে পাকিস্তানী বাহিনী রাজাকারদের জন্য ক্যাম্প স্থাপন করে। আশেপাশের নিরীহ লোকদের ধরে এনে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে

স্কুলের পাশে অবস্থিত ডোবায় ফেলে মাটি চাপা দেয়া হত। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে ভবনগুলো নির্যাতন কেন্দ্র ও ওপি টাওয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পরে আছে। যে কোন সময় বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণের অনুদান এলে কালের সাক্ষী ভবনগুলো হারিয়ে যাবে।
রামচন্দ্রকুঁড়া ফরেস্ট বিট অফিস : মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী বাহিনী নাকুগাঁও সীমান্তের সন্নিকটে রামচন্দ্রকুঁড়া ফরেস্ট বিট অফিসে ক্যাম্প স্থাপন করে। মূলত এই ক্যাম্পটিতে রাজাকার বাহিনী অবস্থান করতো। আজ এই ফরেস্ট বিট অফিসটি ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

সরিষাবাড়ি আলিম মাদ্রাসা ক্যাম্প : ১৯৭১ সালে বদর বাহিনী পাকিস্তানী বাহিনীর সহায়তায় মাদ্রাসায় সরিষাবাড়ির বৃহৎ নির্যাতন কেন্দ্রে পরিণত করেন।

পথে-প্রবাসে শোক থেকে শক্তিতে

মঞ্জিলা ইসলাম

‘শোক থেকে শক্তি’ অভিযাত্রীর অদম্য পদযাত্রায় শেষ যে বার অংশ নিয়েছিলাম সেটা ছিল ২০১৭ সালের ২৬ মার্চ। একই দিনে আগের বছরও হেঁটেছিলাম শহীদ মিনার থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ সাভার পর্যন্ত, প্রায় ৩৫ কিলোমিটার। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা- এমন একটা অর্থবহতা থাকে আমাদের এই পথচলায়। বাংলাদেশী হিসেবে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের এর চেয়ে সুন্দর উদাহরণ খুব কম হয়। ২০১৭ সালের শেষ দিকে আমি মার্কিন মুল্লুকের টেক্সাসে পাড়ি জমাই। তাই পরের বছরগুলোতে আমার খুব প্রিয় এই ইভেন্টে আর অংশ নেয়া সম্ভব হয়নি।

এ বছর ২৬ মার্চের ক’দিন আগে ভেবে দেখলাম, কেমন হয় যদি আমি একা একাই ৩৫ কিলোমিটার (২২.৫ মাইল) হাঁটি? আমি যদি অদম্য পদযাত্রাকে এতটাই মিস করি, তাহলে এ হয়ত আমার একটা সুযোগ। এই ভাবনা থেকেই মিলে গেল আমার অদম্য পদযাত্রার অনুপ্রেরণা।

২৬ মার্চ সকাল বেলা উঠতেই দেরী হয়ে গেল। আমরা সময়ে যেহেতু পিছিয়ে, তাই জানা মতে তখন বাংলাদেশে ২৬ মার্চ সন্ধ্যাবেলা। আমার বন্ধুরা তখন নিশ্চয় সাভার থেকে বাসে করে ফিরছে। আমি হালকা নাস্তা করে বেরিয়ে পড়লাম। তখন দুপুর হয়ে গেছে, প্রায় ১টা বাজে। তবে রৌদ্রের তেজ নেই, দেখে নিলাম আজ ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি তাপমাত্রা। তবুও ব্যাগে ছাতা নিয়েছি, সামান্য স্ন্যাক্স-বাদাম, মোবাইলের চার্জার, পানির বোতল। অভিযাত্রী-টিপস অনুযায়ী পরেছি ডাবল মোজা ও আগের দিন সন্ধ্যায় নওশিনের পাঠানো ছবিতে অভিযাত্রীর এবারের টি-শার্ট দেখতে পেলাম। আমি চেয়েছিলাম একই রকম রঙের কিছু পরতে। কিন্তু এরকম কিছু না থাকায় কাছাকাছি রঙেরই একটা জামা পরেছি।

যেহেতু আমি চাইলেও শহীদ মিনার থেকে শুরু করে স্মৃতিসৌধে শেষ করতে পারব না, আমার প্ল্যান ছিল আমার বাসা থেকে শুরু করে ২২.৫ মাইল হেঁটে যাওয়া। পথ হিসাবে বেঁছে নিয়েছিলাম আমাদের এখানেই ডাউনটাউন থেকে ‘ডেন্টন কেটি ট্রেইল’ বলে একটা হাঁটার পথ আছে যেখানে মানুষজন হাঁটে বা বাইকিং করে। এই ট্রেইল প্রায় ১১.৫ মাইল লম্বা, শেষ হয়েছে আরেক শহর লুইসভিলে। বাসা থেকে শুরু করলে আর কিছু মাইল যোগ হবে। তাহলে ২২.৫ মাইল হাঁটার জন্য হয় আমাকে একই পথে ফিরে আসতে হবে বা সামনে এগিয়ে যেতে হবে সাধারণ পথচারীদের রাস্তা ধরে। পরেরটা পরে ভাবব, আপাতত যাত্রা শুরু করলাম।

মোটামুটি অল্প সময়েই শহরের রাস্তা ছেড়ে ট্রেইলে উঠে গেছি। হাঁটার জন্য এই রাস্তাটা চমৎকার। দৃশ্যগুলো সুন্দর, অন্যরা যারা ব্যায়াম করছে বা বাইকিং করছে তারা ভদ্রতা করে হাসবে বা “হাই” দিবে। ট্রেইলের পাশেই ‘A train’-এর লাইন। দুই বগির এই ট্রেন আমাদের শহর থেকে লুইসভিলসহ আরও নানান শহরে যায়। আমি ততক্ষণে ভালই স্পিডে হাঁটছি। প্রায় সাড়ে তিন মাইল থেকে চার মাইল প্রতি ঘন্টায়। তখনও একটুও হাঁপাইনি, তখনও এত এনার্জি যে মনেই হচ্ছে না কখনও হাঁপাবো

দেখতে দেখতে ডেন্টন ছাড়িয়ে এলাম। এবারে কিছুক্ষণ কেমন জানি পথটা খুব খালি খালি হয়ে গেল। আশেপাশে মানুষও নেই আবার ঘরবাড়িও চোখে পড়ে না বিশেষ। বাসা থেকে আনা এক বোতল পানি ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। জিভ শুকিয়ে আসছে এবারে, আর আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। এর আগেরবার গুলোতেও দেখছি কিছুক্ষণ হাঁটার পর হাত ঝুলে থাকতে থাকতে আঙ্গুলে রক্ত জমে যায়। আমি ভাবছিলাম যদি আসেপাশে একটা গ্যাস-স্টেশন (গাড়ির তেল নেয়ার জন্য কিছুদূর পর পরই এই জিনিষ চোখে পড়ে, পেট্রোল পাম্পের সাথেই একটা মুদিদোকান মতন থাকে যেখানে নানান খাবার, পানি কিনতে পাওয়া যায়, আবার বাথরুমের সুবিধাও থাকে) চোখে পড়ে তাহলে বোতলে পানি ভরে নিবো। কিন্তু ধূধূ প্রান্তর, আর কিছুই চোখে পড়ছে না। এর মধ্যে খানিক পরে একটা বাচ্চাদের জিমনাস্টিক শেখার স্কুল পেলাম। এই স্কুলের একটা পানির কল থেকে এবারের মত পানি নেয়া হল।

একসময় পাশের শহর করিন্থে এসে পৌছালাম। এখন সামান্য ক্লান্ত মত লাগছে। ভাবলাম লাঞ্চ খেয়ে নিলে হয়ত একটু শক্তি পাব। আনুমানিক তিনটা বাজে। একটা পিৎজার দোকানে গিয়ে বললাম, ‘ভাই এমন কিছু দেন তো যেটা হাঁটতে হাঁটতে খাওয়া যাবে’ ভদ্রলোক বললেন স্যান্ডুইচ খেলে সুবিধা হতে পারে। তাই নিয়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম। তবে সাদুল্লাহপুর বা মিরপুর পেরিয়েই কোথাও কোন স্কুলের মাঠে সবাই মিলে বসে ভাত-ডাল-তরকারি খাওয়ার আনন্দ কি আর তাতে পাওয়া যায়?

খাওয়ার পর একটু এনার্জি এল। এরপর আবার ঝাড়া হাঁটা। হাঁটছি তো হাঁটছি। হাঁটছি আর ভাবছি আমার বন্ধুদের কথা। এতক্ষণে কতই না গল্প হত নওশিন আর লিসার সাথে আর সবার সাথে কতই না দুষ্টুমি হত। রেওয়াজ ভাইয়ের গান শোনাও হল না এবার, রফিক ভাই চিনিয়ে দিলেন না ভাঁট ফুল। নিশাত আপুকে দেখতাম বেশিরভাগ সময়ই দলের সবচেয়ে পেছনে থাকতেন, যে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়েছে সেও যেন নিজেকে একলাটি না ভাবে। আমরা হেঁটেছি যারা তারাই শুধু জানি এই গল্পগুলো।

প্রায় ৬টা নাগাদ আমি লুইসভিল স্টেশনে পৌঁছালাম। বিগত পাঁচ ঘণ্টা ধরে একটানা হাঁটছি। শরীর আর মন এবারে একসাথে বিদ্রোহ শুরু করল। আমি স্টেশনের বেঞ্চে বসে পড়লাম। তখনও আমার প্রায় ৮.৭৭ মাইল পথ হাঁটা বাকি। প্রতিটা মাংসপেশি তখন অসাড় হয়ে আসছে। বাসা থেকে আনা বাদাম ধরনের খাবারটাও চিবুতে পারছি না, জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে, চোয়ালও নড়ছে না। বসে থেকে উঠতে গেলে অন্ধকার দেখছি। এমন সময় মনে পড়ল পানি আসলে তেমন খাওয়া হয়নি পুরোটা সময়। এবার কান্না পাওয়ার উপক্রম হল। কতবার সোহাগ ভাই আর নওশিন পানি খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিত আর ইউসুফ স্ন্যাক্স নিয়ে হাজির হত। পানি না খেলে এসব লম্বা হাঁটায় মাসলে খুব ধকল যায়, আর স্ট্যামিনাও থাকে না। মনে হচ্ছিল বাসায় ফিরে যাই, বাকি পথ আমার পক্ষে শেষ করা আর সম্ভব না। আমার বড় ভাইকে বলে রেখেছিলাম আমার হাঁটা শেষ হলে আমাকে সেখান থেকে এসে নিয়ে যেতে, ভাবছিলাম ওকে ফোন করে আসতে বলব কি-না। অল্প যা পানি ছিল সেটা খেলাম, খালি পায়ে কিছুক্ষণ স্টেশনে আস্তে আস্তে হাঁটলাম। জুতো পরে ভাবছি ভাইয়া কে ফোন দিবো, শেষে আর একবার চেষ্টা করতে ইচ্ছে হল। দেখিই না কতটুক পারি। আবার হাঁটতে শুরু করলাম লুইসভিল স্টেশন থেকে। এবারে খুব অল্প স্পীডে হাঁটছি। তবে সবার আগে গ্যাস স্টেশন খুঁজে পানি নিলাম আর বেশি বেশি খেলাম।

আমি আসলে জানতাম না যে ট্রেইলটা আরও খানিকটা বেড়ে সামনে এগিয়েছে লুইসভিল থেকে। তবু এবার আমি ভাবলাম একটু সাধারণ গাড়ি চলাচলের যে রাস্তা ওর পাশের সাইডওয়াক দিয়েই এবার কিছুক্ষণ হাঁটি। এ অভিজ্ঞতাও খারাপ না, পাশ দিয়ে শাঁ শাঁ করে ঘণ্টায় প্রায় ৬০ মাইল বেগে গাড়িগুলো চলে যাচ্ছে। আমি সাবধানে হাঁটছি কারণ কিছু রাস্তার পাশে সাইডওয়াকও ছিল না। এসব রাস্তার পাশের দৃশ্য আহামরি মনোরম নয়। শুধু গাড়ি গুলো ছুটে চলেছে আর দোকানপাট। একটা পর্যায়ে দেখি রাস্তায় কন্সট্রাকশনের কাজ চলছে, সামনে এগুতে হলে খুব ঘুরে আসতে হবে। এতটা ঝামেলা ভাল লাগছিল না। আমি উলটাদিকে হেঁটে আবার লুইসভিল স্টেশনে আসলাম। এবার ট্রেইলে হাঁটার প্ল্যান। বিকেল পড়তে শুরু করেছে। অন্ধকার হতে আর বেশি বাকি নেই। আস্তে আস্তে একটু জোর ফিরে পাওয়ায় আমিও স্পিড বাড়িয়ে হাঁটছি। বের হওয়া মানুষ গুলো পাশে কুকুর নিয়ে হাঁটছে, পাশের গলফ্ কোর্ট থেকে জিনিষপত্র গুছিয়ে কিছু মানুষ বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। ততক্ষণে আমি ভূতে পাওয়া মানুষের মত হাঁটছি। আগেও দেখছি এ সময়টাই সবাই কেমন জানি অটো পাইলটে চলে যায়। হাঁটতে হবে সামনে এটা ছাড়া যেন আমরা কিছু আর জানি না। ব্যথাও কেমন করে যেন আমরা ভুলে যাই, আমাদের মধ্যের এই আমিকে মাঝে মধ্যে জাগিয়ে তোলার জন্যও মনে হয় মাঝে মাঝে এমন চ্যালেঞ্জ নিজেকে করা উচিত। আমার ২২.৫ মাইল পথ যখন শেষ হল তখন রাত হয়ে গেছে। শেষ করতে সময় লেগেছে ৬ ঘণ্টা ৫১ মিনিট বা প্রায় ৭ ঘণ্টা। লুইসভিল থেকে ভাইয়াকে ফোন দিয়ে বললাম ও যেন আমাকে নিয়ে যায়। ও আসতে আসতে ভাবছিলাম অনেক কিছু। সে সোনালী সময়গুলো কতই না সুন্দর ছিল যখন সন্ধ্যায় আমরা স্মৃতি সৌধের চত্বরে দাঁড়িয়ে একে অন্যকে অভিনন্দন জানাতাম, ছবি তুলতাম, যে দিন চলে গেছে সে দিন কত মধুর ছিল তা তখন বুঝতে পারতাম না। আমার বন্ধুরা সবাই ভাল থাকুক, কোন একদিন আবার একসাথে হাঁটব সবাই।

অতীত বর্তমান ও বিলীয়মান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সমস্ত কোণ থেকে আহরণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সেদিক থেকে Audio-Visual ডকুমেন্টেশনের গুরুত্বকে বর্তমানকালে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে একথাও ভাবার, জাদুঘরে যা সঞ্চিত আছে তার সবটাই কি খাঁটি এবং সত্য? এর কারণ ইতিহাস নিয়ে যে গভীর সংশয় বিরাজমান তা হলো ‘‘History is nothing but set of lies agreed upon.’’

এই পরিপ্রেক্ষিতে ‘শব্দসেনা’ এবং ‘Cyclists of War’ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বেলাল চৌধুরীর মতো ব্যক্তিত্ব নিজে তার কথা বলছেন- Cyclists রা নিজেরা ছবিতে অংশগ্রহণ করবেন। এ তথ্য মিথ্যে হবার নয়। লিখিত বা প্রকাশিত তথ্যের মধ্যে লেখক এবং প্রকাশকের প্রভাব অনেকটাই থাকে। পুরোপুরি নিরপেক্ষ অবস্থান নেওয়া সবসময়ে হয়তো সম্ভব হয় না। এখানেই Audio-Visual ডকুমেন্টেশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সেই প্রচেষ্টায় নিয়োজিত দেখে উৎসাহিত হলাম। এই ফোরামে যুক্ত হতে পেরে জানতে পারলাম এমন সব অজানা তথ্য যা বাংলাদেশের অনেকেই জানেন না। এখানে ‘মফিদুল’ সাহেবের কথা না বলে পারলাম না। ওনার জ্ঞানের পরিধি আমাকে মুগ্ধ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের বাইরে ঘটমান বর্তমানের যে ছবি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যত্নের সাথে তুলে আনতে চাইছে তা খুবই আশাব্যঞ্জক। আজকের ঘটনার যথাযথ ডকুমেন্টেশন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মূল্যবান নথি হিসাবে পরিগনিত হবে।

বাংলাদেশ এখন দ্রুত নগরায়ন এবং শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিছু মুষ্টিমেয় সংখ্যার উপকার হলেও যে বিরাট সংখ্যক মানুষ অন্ধকারের অতলে নিমজ্জিত হবেন তারা হচ্ছেন নিম্নবর্গের মানুষজন। পৃথিবীর ইতিহাস যে আসলে রাজারাণীর আর ক্ষমতাশালীর ইতিহাস একথা এখন সর্বজনবিদিত। নিম্নবর্গের ইতিহাস নিয়ে কারও মাথাব্যাথা নেই। মুক্তিযুদ্ধের থিম বাদে বাকি যে দুটি ছবি এবার Research Development-এর জন্য নির্বাচিত হয়েছে তাদের মধ্যে এই সাবলটার্ন সমাজের ছবি ভেসে উঠেছে। এদের কথা এখনকার আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। Development-এর প্রয়োজনে কিছু মানুষের ক্ষতি মেনে নিতে হয়। আশ্চর্য্যজনকভাবে এই কিছু মানুষ সবসময়েই নিম্নবর্গের মানুষ। একথা সর্বত্র প্রযোজ্য। নগরায়ণ আর শিল্পপ্রসারের নামে মানুষকে প্রকৃতি থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার যে চেষ্টা সেই প্রসঙ্গে আমার প্রিয় আমেরিকান ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফার Ansel Adams-এর একটা কথা বলে শেষ করি ‘‘We all know the ragedy of the `dustbowls.’ The cruel unforgivable erosion of the soil and the shrinking of the noble forests, we know that such catastrophes shrivel the spirit of people. The nature is pushed back. Man is everywhere. The solitude so vital to the individual man is almost nowhere.’’

বিলীয়মান নির্জনতা মানুষের মনে যে অবসাদ আনে আর একবার তা স্মরণ করা প্রয়োজন মনে হয়। আশা করি ভবিষ্যতে আবার সুযোগ হবে এমন একটি ফোরামে যোগ দেবার। সবাইকে শুভেচ্ছা, সুস্থ থাকবেন।

আমার দেখা কিংবদন্তী কবরী

রূপালী পর্দার অধরা নায়িকা যেভাবে হয়ে উঠলেন মুক্তিযোদ্ধা

আমেনা খাতুন, *ব্যবস্থাপক, কিউরেশন এন্ড আর্কাইভ*

তখনও হলে গিয়ে ছবি দেখার অনুমতি নেই আমাদের। বিটিভিতে প্রচারিত **ছায়াছবির গান** অনুষ্ঠানে *'সে যে কেন এলো না কিছু ভালো লাগে না...'* গানের মধ্য দিয়ে কবরীকে দেখা। খানিকটা জানতে পারি আমার সংগীতগুরু ময়মনসিংহের ওস্তাদ হায়দার আলী খানের কাছে। কবরীর পারিবারিক নাম মিনা পাল গুরুর কাছেই শোনা। মিনা পাল ও নিনা পাল দুই বোন গান শিখতেন তাঁর কাছে। তারা একসাথে মঞ্চে অভিনয়ও করেছেন। একটি সাদাকালো আলোকচিত্রে দেখা যায়, বেহুলা তাঁর স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় বসে থাকা সর্পরাজের কাছে করজোড়ে মিনতি করে স্বামীর জীবন ভিক্ষা চাইছেন। আমি আগ্রহ নিয়ে ওস্তাদজীকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন? বললেন 'না, নাচ দেখিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারলে তবেই বর দেবো বলেছিলাম!' এইভাবে গুরুর সাথে মঞ্চে অভিনীত 'বেহুলা লক্ষিন্দর'-এর স্থিরচিত্রের মাধ্যমে কবরীকে ভিন্নভাবে জানি। সময় মত রিহার্সেলে আসতেন এবং বাধ্য ছাত্রীর মতো পাঠ নিতেন। মিষ্টি হাসির অধিকারী মিনাকে সংসারের টানাপোড়েন মলিন করেনি কখনও। বরং রিহার্সালের ফাঁকে ফাঁকে খুনশুটিতে সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন চঞ্চল স্বভাবের কিশোরী কন্যা মিনা। কবরীকে আদর্শ করে গুরুজী শিশু-কিশোরদের শিল্প-সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহী করতে চেষ্টা করতেন। আজ তাঁরা দুজনই আমার কাছে আদর্শ, শতাব্দীর মাইলফলক

রচনাকারী কিংবদন্তী।

এরপর কাছে থেকে কবরীকে দেখি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডাঃ সারওয়ার আলীর তত্ত্বাবধানে **মুক্তিযুদ্ধে সংস্কৃতি কর্মী** শিরোনামে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর সুবাদে। তিনি আমাকে কবরীর নাম্বার দিয়ে বললেন তাঁর সাথে যোগাযোগ করে '৭১-এর কিছু পেলে নিয়ে আসতে। তখন হাতে হাতে মোবাইল ফোন ছিল না। এনালগ ফোনই ভরসা। যাঁদের নাম্বার পেয়েছিলাম তাঁরা প্রত্যেকেই ব্যস্ত সেলিব্রেটি। যোগাযোগ সহজ ছিল না। বহু চেষ্টা করে আপার সাথে যোগাযোগ হলো। পরিচয় দিয়ে বললাম, সারওয়ার ভাই আপনার নাম্বার দিয়েছেন। তিনি বললেন- ***হ্যাঁ, সারওয়ার ভাই বলেছেন তুমি ফোন করবে***। আমাকে তাঁর অফিসে যেতে বললেন। তবে, যাওয়ার দুদিন আগে যেন ফোন করে যাই। দু'দিন আগে ফোন করলাম সাড়া নেই, বিকেলে ফোনে সাড়া নেই। পরের দিন সকালে আবার ফোন করি। একটি ছেলে-কণ্ঠ, কথা জড়ানো, তবে আপ্রাণ বোঝাতে চেষ্টা করেছেন তিনি ঢাকায় নেই। নির্ধারিত দিনে আবার ফোন করি। ফোন ধরে বললেন, ***আমি নেই যেহেতু সেহেতু বারবার ফোন করার দরকার ছিল না। হঠাৎ কোলকাতা যেতে হয়েছে, অবশ্য তোমাকে জানিয়ে গেলে হয়ত তুমি এতবার ফোন করতে না।*** কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে। আমার মন খারাপ হলো। তবে সেদিনই তিনি যেতে বললেন। সারওয়ার ভাইকে জানালাম। অভিজ্ঞতা শেয়ার করলাম। তিনি বললেন, ***কিছু মনে করো না, ও এ রকমই মুডি, তবে মেয়ে ভালো!***

যথাসময়ে বিকেলে তাঁর অফিসে পৌঁছলাম। এরপর আমাকে পরিচয় করালেন সবার সাথে। **এ হলো আমেনা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কিউরেটর! ভাবা যায়, মুক্তিযুদ্ধ দেখেওনি অথচ ইতিহাস রক্ষার কাজ করছে!! এই তুমি তোমার পরিচয় দাও।** আমি অবাক, তখন কিউরেটর কি আমি নিজেও ভালো করে জানি না। বললাম, আমি জাদুঘরের ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা। কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, **তুমি একদিন কিউরেটর হবে! কমবয়সীদের এই এক সমস্যা, গভীরতা কম। একবার বকা দিয়েছি না ফোনে! হুম কেন দিয়েছি পরে বুঝবে। আমার ছেলে ফোন ধরেছিল। ও এত কিছু কি করে বুঝিয়ে বলবে। যদিও ও গুড ম্যানার্ড বয়! এসো আমার টেবিলের সামনে চেয়ার নিয়ে বসো।** আহা, বকা এত মিষ্টি আর আন্তরিক হতে পারে!

আমি বসলাম। ড্রয়ার থেকে তিনি একটি রেকর্ড বের করে টেবিলের উপর রাখলেন। দেখলাম ইতিহাসের দলিল। ভারতের মেগাফোন কোম্পানির ৪৫ আরপিএম রেকর্ড। রেকর্ডে ধারণ করা আছে **সলিল চৌধুরীর** লেখা **চিত্রনায়িকা কবরীর** পাঠ করা নাতিদীর্ঘ নাটিকা/কথিকা *"আমি খালিদের মা বলছি"*। বললেন, ***দেখ কিছু উদ্ধার করতে পারো কিনা! আমার মনে ছিল না এটা আছে। সারওয়ার ভাই যখন বললেন খুঁজে দেখেন যদি কিছু পাওয়া যায়। এরপর বহু কষ্টে খুঁজে এটা পেলাম। কপি করলে একটা কপি আমাকে দিবে। আর শোনো, আমরা তো এতকিছু ভেবে দেশের জন্য কাজ করিনি, যে কোনোদিন এসব কাজে লাগবে! তাই সংরক্ষণও করিনি। আচ্ছা বল তো কি করতে চাইছো তোমরা?*** আমি প্রদর্শনীর থিম শেয়ার করলাম। আলাপচারিতার মাঝে একে একে মুক্তিযুদ্ধের সময় কীভাবে দেশে পরিবার-পরিজন ছেড়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভারতে গেলেন। ভারতে পৌঁছে বিশ্ববাসীকে পাক আর্মি কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা ও বাঙালি সংস্কৃতির উপর নিষেধাজ্ঞার কথা বলেছেন, প্রচার করেছেন নানা মাধ্যমে। বলেছেন আনন্দবাজার পত্রিকায় দেয়া তাঁর সাক্ষাৎকারের কথা। তখন এসব শুনে অবাক হয়েছি। অমূল্য স্মারক আমার হাতে তুলে দিলেন সকলের সামনে। আর বললেন, **তোমরা সাক্ষী রইলে আমেনা আমাকে এর কপি করে দিবে।** নিজে এগিয়ে এসে দরজা খুলে বিদায় দিলেন। লক্ষ্য করলাম, কবরীর শাড়ি পরার ধরন ভিন্ন! প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনি। মনে হলো শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রিকা কুমারাতুংগার মতো! পরে দেখি না, সে তো ভিন্ন উপায়ে ক্যান্ডিয়ান স্টাইল! তবে!? কবরীর শাড়ী পরায় কী ভিন্নতা যে এক অন্যরকম আবেদন তৈরি করে!?

ফিরে আসি মূল কথায়। সেগুনবাগিচাস্থ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মিলনায়তন থেকে শুরু করে ভিতরের চত্বর জুড়ে বিশাল আকারে **মুক্তিযুদ্ধে সংস্কৃতি কর্মী** প্রদর্শনীতে রেকর্ডটি প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনী দেখতে আসেন তিনি দুবার। একবার সাথে করে নিয়ে আসেন তাঁর আজীবন শিশু কনিষ্ঠ পুত্রটিকে। আমি বুঝলাম বারবার ফোন করায় বিরক্ত হওয়ার কারণ। মিষ্টি মেয়ে কবরী মিষ্টি হাসির বিপরীতে তার মিষ্টি হৃদয় কত যে চ্যালেঞ্জ জীবনে গ্রহণ করেছেন সে খবর ক'জন জানেন!

আবার তাঁকে আবিষ্কার করি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্মারক ভাণ্ডারে। ষাটের দশকের তরুণ **কুদরৎ-ই-ইলাহি'র** আঁকা স্কেচে। এই স্কেচে ফুটে উঠে ৬০/৭০-এর দশকের তরুণদের মাঝে কবরীকে নিয়ে ফ্যান্টাসি। স্কেচটি **কুদরৎ-ই-ইলাহি** নিজ হাতে বাঁশের চেলা দিয়ে ফ্রেম করে পড়ার টেবিলের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। পরে এই তরুণ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে শহীদ হন।

এর অনেকদিন পর আগারগাঁওয়ে নিজস্ব ভবনে প্রদর্শনী কাজে গবেষণা করতে গিয়ে কবরীর কথোপকথনে উঠে আসা সেই খনির সন্ধান মেলে কিছুটা। পেয়ে যাই ভারতে ধারণকৃত কবরী-এর সাক্ষাৎকারমূলক একটি সচিত্র প্রতিবেদন। যেখানে তিনি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের উপর পাকিস্তান আর্মির নিপীড়ন ও বাঙালি সংস্কৃতির উপর আঘাতের কথা।

এভাবেই এক কিশোরীর কল্পনায় **রূপালী পর্দার অধরা নায়িকা কবরী** তারুণ্যে এসে উদ্ভাসিত হলো একজন **মুক্তিযোদ্ধা** হিসেবে। ধীরে ধীরে তাঁর জীবনাদর্শ, দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধ আমার কাছে হয়ে উঠে বিস্ময়কর। তিনি বেঁচে থাকতে এই কথাগুলো তাঁকে মৌখিক অথবা কোনো লেখার মাধ্যমে জানানো হয়নি। এই আফসোস আজীবন থেকে যাবে। কিন্তু যেদিন তিনি চলে গেলেন, সেদিন থেকে মনোপীড়নে ভুগছিলাম। আমার একটি দায়বদ্ধতা রয়েছে এই দেশের জন্য তাঁর অবদান তুলে ধরার। এসকল তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দেখতে চাওয়া কি করে কুদরৎ-ই-ইলাহি থেকে শুরু করে বাংলার প্রতিটি তরুণের হার্টথ্রব নায়িকা কবরী নেমে এলেন সাধারণ মানুষের কাতারে। তাঁর কাজের জায়গা থেকেই মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখে চললেন এবং হাতে অস্ত্র না তুলেও হয়ে উঠলেন মুক্তিযোদ্ধা। এই সত্য প্রতিষ্ঠার দায় আমার, আপনার এবং এদেশের মানুষের।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official